অধ্যায় ৭ : সূত্র নির্দেশ/উল্লেখপঞ্জি/তথ্য সমীক্ষা এবং টীকা প্রদানের পদ্ধতি

বিন্যাসক্রম

৭.১ জ্ঞাতব্য বিষয়
৭.২ পরিচিতি
৭.৩ সূত্র নির্দেশের পরিচয়
৭.৪ সূত্র নির্দেশ প্রদানের প্রচলিত নিয়ম ও পদ্ধতি
৭.৫ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম
৭.৬ অতিরিক্ত পঠন
৭.৭ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত
৭.৮ আদর্শ প্রশ্নাবলি

৭.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

এই অধ্যায় পাঠ করে শিক্ষার্থী—

- গবেষণায় সূত্র বিষয়ে পরিচিত হবেন।
- গবেষণা সূত্রের প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে ধারণা গ্রহণ করতে পারবেন।
- সূত্রের বিভিন্ন ধরন বিষয়ে জানতে পারবেন।
- সূত্র বিষয়ে সামগ্রিক জ্ঞান সংগ্রহ দ্বারা তাকে বাস্তবে প্রয়োগ উপযোগী করে তুলতে পারবেন।

৭.২ পরিচিতি

একজন গবেষক যে বিষয়টি নির্বাচন করবেন, সে সম্পর্কে কী কী তথ্য আছে, তার মূল্যায়ন গবেষককে করতে হবে। যে বিষয় নিয়ে গবেষক কাজ করবেন বলে মনস্থির করেছেন, সেই বিষয় সম্পৃক্ত পূর্ববর্তী কাজ সম্পর্কে লেখকের ধারণা থাকতে হবে এবং সেগুলির মূল্যায়ন করতে হবে। লিটারেচার রিভিউ-এর মধ্যে দিয়ে দু'টি কাজ হবে। এক. অতীতের গবেষণার ক্ষেত্র, পদ্ধতি, সিদ্ধান্ত ইত্যাদি লেখক জানতে পারবেন। দুই. অতীতের কাজের পুনরাবৃত্তি বর্জন করে, নিজের কাজের ক্ষেত্রটিকে আরও সুচিহ্নিত করে নিতে পারবেন। যদি এমন হয় যে, গবেষক যে বিষয়টি নিয়ে কাজ করতে চলেছেন সে বিষয়ে কোন লিটারেচার নেই, সে ক্ষেত্রে তথ্যের অলভ্যতা লেখককে উল্লেখ করতে হবে। নতুন কিছু খুঁজে পেলে বা আবিষ্কার হলে সে বিষয়ে পূর্বের কোন তথ্য না পাওয়াই স্বাভাবিক। তবে সাহিত্যের কাজের ক্ষেত্রে গবেষকের উপাদানই হল লিটারেচার। সেগুলির মূল্যায়ন বা তার সমধর্মী উপাদানের মূল্যায়ন

গবেষক করতেই পারে। তবে, এখানে Literature Review বলতে পূর্বেই যা কাজ হয়েছে তার মূল্যায়নকেই বোঝানো হয়েছে।

৭.৩ সূত্র নির্দেশের পরিচয়

সাহিত্য গবেষণা মূলত একটি সুসংবদ্ধ ও পদ্ধতিগত জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্র, যেখানে গবেষককে নিজস্ব বিশ্লেষণ ও সমালোচনার পাশাপাশি পূর্ববর্তী গবেষণা, প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব এবং প্রামাণ্য উৎসের উপর নির্ভর করতে হয়। এই গবেষণা প্রক্রিয়ায় "সূত্র নির্দেশ" বা Citation/Referencing একটি অপরিহার্য উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়। সূত্র নির্দেশ বলতে বোঝায় গবেষণাপত্রে ব্যবহৃত তথ্য, মতামত, তত্ত্ব বা উদ্ধৃতির উৎসকে যথাযথভাবে উল্লেখ করা। এর মাধ্যমে গবেষণার স্বচ্ছতা নিশ্চিত হয়, একই সঙ্গে গবেষণার গ্রহণযোগ্যতা ও একাডেমিক সততাও বজায় থাকে।

প্রথমত, সূত্র নির্দেশ গবেষণার নৈতিকতার সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত। গবেষণায় অন্যের ধারণা, মতামত বা বিশ্লেষণ ব্যবহার করে তা নিজের বলে উপস্থাপন করা একাডেমিক চৌর্যবৃত্তি (Plagiarism) হিসেবে বিবেচিত হয়, যা গবেষণার ক্ষেত্রে গুরুতর অপরাধ। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনো গবেষক কাজী নজরুল ইসলামের কবিতায় বিদ্রোহী চেতনার উপস্থিতি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে অন্য কোনো সমালোচকের বক্তব্য ব্যবহার করেন, তবে সেই উৎস উল্লেখ করা আবশ্যক। যেমন— "নজরুলের কবিতায় বিদ্রোহী চেতনা অত্যন্ত শক্তিশালীভাবে প্রকাশিত হয়েছে" (রহমান, ২০১৫, পৃ. ৪৫)। এখানে গবেষক সঠিকভাবে উৎস উল্লেখ করেছেন এবং গবেষণার নৈতিকতা রক্ষা করেছেন।

দ্বিতীয়ত, সূত্র নির্দেশ গবেষণার প্রামাণ্যতা বৃদ্ধি করে। গবেষণাপত্রে স্বীকৃত গবেষক বা প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থের উল্লেখ থাকলে গবেষণার বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়। পাঠক তখন সহজেই উপলব্ধি করতে পারেন যে গবেষকের বক্তব্য ব্যক্তিগত মতামতের উপর নয়, বরং পূর্ববর্তী গবেষণার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। উদাহরণস্বরূপ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *ঘরে-বাইরে* উপন্যাসের উপর গবেষণায় যদি উল্লেখ করা হয়— "উপন্যাসটির অন্যতম প্রধান বিষয় জাতীয়তাবাদের সংকট" (সেন, ২০০২), তাহলে পাঠকের কাছে এই বক্তব্য অধিক গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে, কারণ এটি একটি নির্দিষ্ট গবেষণার ভিত্তিতে উপস্থাপিত হয়েছে।

তৃতীয়ত, সূত্র নির্দেশ পাঠককে আরও তথ্য অনুসন্ধানে সহায়তা করে। গবেষণাপত্রের শেষে প্রদত্ত গ্রন্থপঞ্জি বা রেফারেন্স তালিকার মাধ্যমে পাঠক মূল উৎসে পৌঁছাতে পারেন এবং বিষয় সম্পর্কে আরও বিস্তৃত ধারণা লাভ করতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ— Rahman, A. (2015). *Nazrul's Revolutionary Poetry*. Dhaka: Academic Press. এই তথ্যের ভিত্তিতে পাঠক সংশ্লিষ্ট গ্রন্থটি সংগ্রহ করে বিষয়টি নিয়ে গভীরতর অধ্যয়ন করতে পারেন। ফলে গবেষণা জ্ঞানচর্চার ধারাবাহিকতাকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

সূত্র নির্দেশের বিভিন্ন পদ্ধতি বা স্টাইল রয়েছে, যেমন—APA, MLA, Chicago ইত্যাদি। সাহিত্য গবেষণায় সাধারণত MLA স্টাইল অধিক ব্যবহৃত হয়, যদিও অনেক ক্ষেত্রে APA স্টাইলও ব্যবহৃত

হয়। প্রতিটি স্টাইলের নিজস্ব নিয়ম ও কাঠামো রয়েছে। যেমন—MLA স্টাইলে বইয়ের সূত্র নির্দেশ— Rahman, Abdul. *Nazrul's Revolutionary Poetry*. Dhaka: Academic Press, 2015. অন্যদিকে APA স্টাইলে— Rahman, A. (2015). *Nazrul's revolutionary poetry*. Dhaka: Academic Press. এখানে লক্ষ্য করা যায়, একই তথ্য হলেও স্টাইল অনুযায়ী উপস্থাপনার ধরন পরিবর্তিত হয়েছে।

সূত্র নির্দেশের প্রধানত দুটি অংশ রয়েছে—

১.ইন-টেক্সট সাইটেশন (In-text citation)

২. গ্রন্থপঞ্জি বা রেফারেন্স তালিকা (Bibliography/References)

ইন-টেক্সট সাইটেশন মূল লেখার মধ্যে সংক্ষিপ্তভাবে উৎসের উল্লেখ করে। যেমন— "Literature reflects the socio-political condition of its time" (Eagleton 45)। এখানে লেখকের নাম এবং পৃষ্ঠাসংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে। অপরদিকে গ্রন্থপঞ্জিতে পূর্ণাঙ্গ তথ্য প্রদান করা হয়— Eagleton, Terry. *Literary Theory: An Introduction*. Oxford: Blackwell, 1983.

সাহিত্য গবেষণায় সূত্র নির্দেশ ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করা প্রয়োজন। প্রথমত, সরাসরি উদ্ধৃতি ব্যবহার করলে অবশ্যই উদ্ধৃতি চিহ্ন ব্যবহার করতে হবে এবং উৎস উল্লেখ করতে হবে। যেমন— "Poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings" (Wordsworth 12)।

দ্বিতীয়ত, অন্যের ধারণা নিজের ভাষায় উপস্থাপন করলেও উৎস উল্লেখ করতে হবে। যেমন— Wordsworth মনে করেন, কবিতা গভীর আবেগের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ (Wordsworth 12)।

তৃতীয়ত, একই গবেষণাপত্রে একটি নির্দিষ্ট সূত্র নির্দেশ পদ্ধতি ধারাবাহিকভাবে অনুসরণ করা উচিত। ভিন্ন ভিন্ন স্টাইল একসঙ্গে ব্যবহার করলে গবেষণার মান ও একাডেমিক শৃঙ্খলা ক্ষুণ্ন হয়।

চতুর্থত, আধুনিক যুগে অনলাইন উৎসের ব্যবহার ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ওয়েবসাইট বা ডিজিটাল উৎস থেকেও তথ্য গ্রহণ করলে সঠিকভাবে সূত্র নির্দেশ করতে হয়। যেমন— Ahmed, S. "Modern Bengali Poetry." *Poetry Archive*, 2020, www.poetryarchive.org. এছাড়া গবেষণায় জার্নাল প্রবন্ধ, থিসিস, সংবাদপত্র, সাক্ষাৎকার অথবা অনলাইন ডাটাবেস থেকেও তথ্য গ্রহণ করা যেতে পারে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই যথাযথ সূত্র নির্দেশ অপরিহার্য। সর্বোপরি বলা যায়, সাহিত্য গবেষণায় সূত্র নির্দেশ কেবল আনুষ্ঠানিকতা নয়; এটি গবেষণার বুদ্ধিবৃত্তিক সততা, প্রামাণ্যতা এবং জ্ঞানচর্চার ধারাবাহিকতার গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। সঠিকভাবে সূত্র নির্দেশ ব্যবহার করলে গবেষণাপত্র যেমন গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে, তেমনি গবেষকের একাডেমিক দায়িত্ববোধ ও পেশাগত সততাও প্রতিফলিত হয়। তাই এম.এ. পর্যায়ের শিক্ষার্থী থেকে শুরু করে গবেষকদের জন্য সূত্র নির্দেশের নিয়মাবলি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা অর্জন এবং তা যথাযথভাবে প্রয়োগ করা অত্যন্ত জরুরি।

অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

১। সূত্র নির্দেশের পরিচয় প্রদান করুন। (২০০ শব্দের মধ্যে)

৭.৪ সূত্র নির্দেশ প্রদানের প্রচলিত নিয়ম ও পদ্ধতি

সাহিত্য গবেষণা মানবিক বিদ্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ ও সুসংগঠিত জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্র। সাহিত্যের পাঠ, বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা এবং মূল্যায়নের মাধ্যমে সাহিত্য গবেষণা কেবল সাহিত্যিক রচনার অর্থ উন্মোচন করে না, বরং ভাষা, সংস্কৃতি, সমাজ ও ইতিহাসের গভীর সম্পর্ককেও উদ্ঘাটন করে। এই কারণে সাহিত্য গবেষণা কখনোই সম্পূর্ণ ব্যক্তিনির্ভর নয়; বরং এটি পূর্ববর্তী গবেষণা, তাত্ত্বিক আলোচনা, সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থসমূহের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। গবেষণার এই পদ্ধতিগত ও বৈজ্ঞানিক চরিত্র বজায় রাখার জন্য গবেষককে ব্যবহৃত তথ্য, তত্ত্ব ও মতামতের উৎস স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হয়। এই উৎস উল্লেখ করার প্রক্রিয়াকেই বলা হয় "সূত্র নির্দেশ" বা Citation/Referencing। সূত্র নির্দেশের মাধ্যমে গবেষক তার বক্তব্যের ভিত্তি স্পষ্ট করেন এবং পাঠকের কাছে গবেষণার গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করেন। একই সঙ্গে এটি গবেষণার স্বচ্ছতা ও একাডেমিক সততা বজায় রাখতে সহায়তা করে।

গবেষণায় ব্যবহৃত ধারণা, মতামত বা উদ্ধৃতির উৎস উল্লেখ না করলে তা চৌর্যবৃত্তি (Plagiarism) হিসেবে বিবেচিত হয়। একাডেমিক জগতে এটি একটি গুরুতর অপরাধ। অন্যদিকে সঠিকভাবে সূত্র নির্দেশ ব্যবহার করলে গবেষণা আরও গ্রহণযোগ্য, প্রামাণ্য এবং বৈজ্ঞানিক হয়ে ওঠে। এছাড়া সূত্র নির্দেশ পাঠকদের মূল উৎসে পৌঁছাতে সাহায্য করে, যার ফলে জ্ঞানচর্চার ধারাবাহিকতা বজায় থাকে এবং নতুন গবেষণার পথ উন্মুক্ত হয়। অতএব বলা যায়, সাহিত্য গবেষণায় সূত্র নির্দেশ কেবল একটি আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া নয়; বরং এটি গবেষণার গঠন, বিশ্বাসযোগ্যতা এবং একাডেমিক মান রক্ষার একটি অপরিহার্য উপাদান।

- **সূত্র নির্দেশের প্রয়োজনীয়তা**

প্রথমত, সূত্র নির্দেশ গবেষণাকে চৌর্যবৃত্তি (Plagiarism) থেকে রক্ষা করে। অন্যের ধারণা নিজের নামে উপস্থাপন করা একাডেমিকভাবে অনৈতিক।

দ্বিতীয়ত, এটি গবেষণার প্রামাণ্যতা বৃদ্ধি করে। স্বীকৃত গবেষক ও প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থের উল্লেখ পাঠকের কাছে লেখাটিকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলে।

তৃতীয়ত, সূত্র নির্দেশ পাঠককে মূল উৎসে পৌঁছাতে সাহায্য করে, ফলে জ্ঞানের বিস্তার ঘটে এবং গবেষণার ধারাবাহিকতা বজায় থাকে।

- **সূত্র নির্দেশের প্রচলিত পদ্ধতি**

সাহিত্য গবেষণায় সাধারণত তিনটি বহুল ব্যবহৃত সূত্র নির্দেশ পদ্ধতি রয়েছে—

১. MLA (Modern Language Association)

২. APA (American Psychological Association)

৩. Chicago স্টাইল

সাহিত্য গবেষণায় সাধারণত MLA স্টাইল সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়।

(১) MLA স্টাইল: নিয়ম ও উদাহরণ

MLA স্টাইলে দুটি অংশ থাকে—

(ক) ইন-টেক্সট সাইটেশন

(খ) Works Cited (গ্রন্থপঞ্জি)

ইন-টেক্সট সাইটেশন

এখানে লেখকের নাম ও পৃষ্ঠাসংখ্যা উল্লেখ করা হয়।

উদাহরণ

"রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে মানবতাবাদ একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য" (ঠাকুর ৪৫)।

"বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ দীর্ঘ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ঘটেছে" (চট্টোপাধ্যায় ৬৮)।

"বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ মূলত ধর্মীয় সাহিত্যের বিকাশের যুগ" (সেন ১০২)।

Works Cited (গ্রন্থপঞ্জি)

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *সাহিত্যের পথে*. কলকাতা: বিশ্বভারতী, ২০০২।

চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার। *বাংলা ভাষার ইতিহাস*. কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৪।

সেন, সুকুমার। *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*. কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৫।

(২) APA স্টাইল: নিয়ম ও উদাহরণ

APA স্টাইলে লেখকের নাম, প্রকাশনার সাল এবং পৃষ্ঠাসংখ্যা উল্লেখ করা হয়।

ইন-টেক্সট সাইটেশন

উদাহরণ:

(ঠাকুর, ২০০২, পৃ. ৪৫)

(চট্টোপাধ্যায়, ২০০৪, পৃ. ৬৮)

(সেন, ২০০৫, পৃ. ১০২)

References

ঠাকুর, র. (২০০২)। *সাহিত্যের পথে*. কলকাতা: বিশ্বভারতী।

চট্টোপাধ্যায়, স. ক. (২০০৪)। *বাংলা ভাষার ইতিহাস*. কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স।

সেন, স. (২০০৫)। *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*. কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স।

(৩) Chicago স্টাইল: নিয়ম ও উদাহরণ

Chicago স্টাইল সাধারণত ফুটনোট ভিত্তিক।

উদাহরণ:

"বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বহু প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারক।"[1]

[1] সুকুমার সেন, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস* (কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৫), ১০২।

আরেকটি উদাহরণ—

"বাংলা ভাষা আর্যভাষা পরিবারের অন্তর্গত।"[2]

[2] সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, *বাংলা ভাষার ইতিহাস* (কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৪), ৬৮।

সূত্র নির্দেশ প্রদানের সাধারণ নিয়ম

১. সরাসরি উদ্ধৃতি (Direct Quotation)

যদি অন্যের বক্তব্য হুবহু ব্যবহার করা হয়, তাহলে উদ্ধৃতি চিহ্ন ব্যবহার করতে হবে।

উদাহরণ:

"সাহিত্য মানুষের জীবনেরই প্রতিফলন" (ঠাকুর ৩২)।

২. পরোক্ষ উদ্ধৃতি (Paraphrasing)

অন্যের ধারণা নিজের ভাষায় প্রকাশ করলেও সূত্র উল্লেখ করতে হবে।

উদাহরণ:

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মনে করেন সাহিত্য মানুষের জীবনের অভিজ্ঞতার প্রতিফলন (ঠাকুর ৩২)।

৩. একই স্টাইল অনুসরণ

সাহিত্য গবেষণায় সূত্র নির্দেশ ব্যবহারের ক্ষেত্রে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো একটি নির্দিষ্ট স্টাইল ধারাবাহিকভাবে অনুসরণ করা। গবেষণাপত্রের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একই সূত্র নির্দেশ পদ্ধতি ব্যবহার না করলে গবেষণার গঠনগত শৃঙ্খলা নষ্ট হয় এবং একাডেমিক মানও ক্ষুণ্ন হয়। কারণ MLA, APA এবং Chicago—প্রতিটি স্টাইলের নিজস্ব নিয়ম, বিন্যাস ও উপস্থাপনার ধরন রয়েছে। ফলে একই গবেষণায় ভিন্ন ভিন্ন স্টাইল ব্যবহার করলে তা গবেষণার বৈজ্ঞানিকতা ও পেশাগত মানের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। উদাহরণস্বরূপ, যদি একটি গবেষণাপত্রে MLA স্টাইল ব্যবহার করা হয়, তাহলে ইন-টেক্সট সাইটেশনে লেখকের নাম ও পৃষ্ঠাসংখ্যা উল্লেখ করতে হবে—

যেমন—

"বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ ধর্মীয় সাহিত্যের বিকাশের যুগ" (সেন ১০২)।

কিন্তু যদি একই গবেষণায় অন্যত্র APA স্টাইল ব্যবহার করা হয়—

(সেন, ২০০৫, পৃ. ১০২)

তাহলে দেখা যাবে, একই গবেষণাপত্রে দুটি ভিন্ন স্টাইল ব্যবহার করা হয়েছে, যা একাডেমিকভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। এতে পাঠকের বিভ্রান্তি তৈরি হয় এবং গবেষণার পদ্ধতিগত শৃঙ্খলা নষ্ট হয়।

একইভাবে গ্রন্থপঞ্জির ক্ষেত্রেও ধারাবাহিকতা বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি। যেমন, MLA স্টাইলে গ্রন্থপঞ্জি হবে—

সেন, সুকুমার। *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস.* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৫।

কিন্তু APA স্টাইলে এটি হবে—

সেন, স. (২০০৫)। *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস.* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স।

যদি একই গ্রন্থপঞ্জিতে দুটি ভিন্ন রীতি ব্যবহার করা হয়, তাহলে গবেষণাপত্রের সামগ্রিক বিন্যাস অসংগঠিত হয়ে পড়ে।

এছাড়াও, একই স্টাইল অনুসরণ করার ক্ষেত্রে আরও কিছু বিষয় লক্ষ্য করা প্রয়োজন—

প্রথমত, ইন-টেক্সট সাইটেশন, ফুটনোট এবং গ্রন্থপঞ্জি—এই তিনটি অংশেই একই স্টাইল বজায় রাখতে হবে।

দ্বিতীয়ত, একই স্টাইল অনুসরণ করার সময় যতিচিহ্ন, ইটালিক ব্যবহার, প্রকাশনার সাল, প্রকাশকের নাম ইত্যাদি বিষয়েও সতর্ক থাকতে হবে।

তৃতীয়ত, একই লেখকের একাধিক গ্রন্থ ব্যবহৃত হলে নির্বাচিত স্টাইল অনুযায়ী সেগুলোর উপস্থাপন একই রীতিতে করতে হবে।

উদাহরণ (MLA স্টাইল):

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *সাহিত্যের পথে.* কলকাতা: বিশ্বভারতী, ২০০২।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *বাংলা সাহিত্য.* কলকাতা: বিশ্বভারতী, ২০০১।

চতুর্থত, আধুনিক গবেষণায় বইয়ের পাশাপাশি জার্নাল, থিসিস, ওয়েবসাইট, সাক্ষাৎকার ইত্যাদি বিভিন্ন উৎস ব্যবহার করা হয়। এসব ক্ষেত্রেও নির্বাচিত স্টাইল অনুযায়ী সূত্র নির্দেশ দিতে হবে।

উদাহরণ (MLA স্টাইল):

চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার। *বাংলা ভাষার ইতিহাস.* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৪।

দাশ, বুদ্ধদেব। "বাংলা কবিতার আধুনিকতা।" *দেশ*, ১৯৯৮।

অতএব বলা যায়, একই স্টাইল ধারাবাহিকভাবে অনুসরণ করা গবেষণার গঠনগত শৃঙ্খলা, একাডেমিক মান এবং পেশাগত গ্রহণযোগ্যতা বজায় রাখার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি গবেষণাকে সুসংগঠিত করে এবং পাঠকের কাছে গবেষণার উপস্থাপনাকে আরও পরিষ্কার ও গ্রহণযোগ্য করে তোলে।

৪. গ্রন্থপঞ্জি সাজানো

গ্রন্থপঞ্জি সাধারণত বর্ণানুক্রমে সাজানো হয়।

উদাহরণ:

চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার। *বাংলা ভাষার ইতিহাস.* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৪।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *সাহিত্যের পথে.* কলকাতা: বিশ্বভারতী, ২০০২।

সেন, সুকুমার। *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস.* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৫।

সাহিত্য গবেষণায় সূত্র নির্দেশ একটি অপরিহার্য উপাদান। এটি গবেষণার নৈতিকতা বজায় রাখে, প্রামাণ্যতা বৃদ্ধি করে এবং জ্ঞানচর্চার ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করে। MLA, APA এবং Chicago—এই

তিনটি পদ্ধতির যেকোনো একটি নির্দিষ্টভাবে অনুসরণ করলে গবেষণা আরও সুসংগঠিত ও গ্রহণযোগ্য হয়। সঠিকভাবে সূত্র নির্দেশ ব্যবহার করা একজন গবেষকের একাডেমিক সততা, দক্ষতা এবং গবেষণাগত দায়িত্ববোধের পরিচয় বহন করে। তাই এম.এ. পর্যায়ের শিক্ষার্থী ও গবেষকদের জন্য সূত্র নির্দেশের নিয়মাবলি জানা এবং তা যথাযথভাবে প্রয়োগ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিম্নে সাহিত্য গবেষণায় ব্যবহৃত সূত্রনির্দেশ চিত্র বিস্তৃতরূপে তুলে ধরা হল।

সাধারণত সূত্র নির্দেশের ক্ষেত্রে দু'টি রীতির কথা বলা যেতে পারে:

ক. ঊর্ধ্বলিপি (Superscript) পদ্ধতি আর খ. লেখক-তারিখ পৃষ্ঠা (Author-date, page system) পদ্ধতি।

ঊর্ধ্বলিপি পদ্ধতি:

এই পদ্ধতিতে মূলত গৃহীত উদ্ধৃতির যথাযথ স্থানে সংখ্যা ব্যবহার করা হয়। সংখ্যাটি সাধারণত উদ্ধৃতির শেষে ওপরের ডান দিকে দেওয়া হয়।

দৃষ্টান্ত: 'আমি বলি কাকা, মিছে করো চেঁচামেচি আকাশেতে উঠে আমি মেঘ হয়ে গেছি। ফিরিব বাতাস বেয়ে রামধনু খুঁজি আলোর অশোক ফুল তুলে দেবো গুঁজি।'

নির্দেশিকা:

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সহজপাঠ, প্রথম ভাগ পুনর্মুদ্রণ, আষাঢ় ১৪১১, বিশ্বভারতী, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৪১ -৪২।

এরকম পদ্ধতি গ্রহণ করলে সুত্র-নির্দেশ দেওয়া থাকবে পাদটীকা (footnote) বা অন্ত্যটীকায় (endnotes)। কয়েকটি ব্যবহৃত দৃষ্টান্ত দেখানো যেতে পারে। যেমন-

ঊর্ধ্বলিপি পদ্ধতি: নিয়ম ও উদাহরণ

একজন লেখকের প্রথম সংস্করণের গ্রন্থ

নিয়ম:

লেখক, গ্রন্থ, প্রকাশকাল, প্রকাশক, প্রকাশের স্থান, পৃষ্ঠা সংখ্যা।

উদাহরণ:

বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্র সাহিত্য: স্বতন্ত্র পাঠ, আগস্ট ২০০৯, এবং মুশায়েরা, কলকাতা, পৃ. ২২।

কোনো লেখকের সংস্করণ হওয়া গ্রন্থ বা পুনর্মুদ্রণ হওয়া গ্রন্থ

নিয়ম:

লেখক, গ্রন্থ, সংস্করণ বা মুদ্রণ, প্রকাশকাল, প্রকাশক, প্রকাশের স্থান, পৃষ্ঠা সংখ্যা

উদাহরণ

বুদ্ধদেব বসু, সাহিত্যচর্চা, তৃতীয় সংস্করণ আগস্ট ১৯৯৬, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ. ৬১।

দুজন লেখকের লেখা কোনো গ্রন্থ

নিয়ম:

লেখকদ্বয়, গ্রন্থ, প্রকাশকাল, প্রকাশক, প্রকাশের স্থান, পৃষ্ঠা সংখ্যা

উদাহরণ:

শামসুল হক ও শাহজাহান তপন, 'শিক্ষা পরিভাষা', ১৯৮৫, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃ. ৫

তিন বা ততোধিক লেখকের গ্রন্থ

নিয়ম:

লেখক (প্রমুখ), গ্রন্থ, প্রকাশকাল, প্রকাশক, প্রকাশের স্থান, পৃষ্ঠা সংখ্যা

উদাহরণ:

আনিসুজ্জামান প্রমুখ, 'বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম', পরিমার্জিত সংস্করণের প্রথম পুনর্মুদ্রণ, ২০১৫, বাংলা একাডেমি, ঢাকা , পৃ. ১১

সম্পাদিত গ্রন্থ:

নিয়ম:

সম্পাদক, গ্রন্থ, প্রকাশকাল, প্রকাশক, প্রকাশের স্থান, পৃষ্ঠা সংখ্যা

উদাহরণ:

পার্থ চট্টোপাধ্যায় (সম্পা) ঈশ্বরগুপ্ত জীবন ও সাহিত্য, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি, ২০১৩, প্রজ্ঞাবিকাশ, কলকাতা, পৃ. ১৩৩।

সম্পাদিত বা সংকলিত গ্রন্থের নির্দিষ্ট অধ্যায় বা প্রবন্ধ

নিয়ম:

লেখক, অধ্যায় বা প্রবন্ধের শিরোনাম, সম্পাদিত বা সংকলিত গ্রন্থ, সম্পাদক বা সংকলক, প্রকাশকাল, প্রকাশক, প্রকাশের স্থান, পৃষ্ঠা সংখ্যা

উদাহরণ:

মৌসুমী চট্টোপাধ্যায় সাহা, 'বাংলা শিশু ও কিশোর সাহিত্য', প্রবন্ধ সঞ্চয়ন, সম্পাদক- ড. সত্যবতী গিরি ও ড. সমরেশ মজুমদার, দ্বিতীয় সংস্করণ মার্চ, ২০০৬, রত্নাবলী, কলকাতা পৃ. ১৫৮৭।

অভিধান বা গ্রন্থকোষ

নিয়ম:

সংকলক, গ্রন্থ, প্রকাশকাল, প্রকাশক, প্রকাশের স্থান, পৃষ্ঠা সংখ্যা

উদাহরণ:

অশোক মুখোপাধ্যায়, (সংক) 'সংসদ সমার্থশব্দকোষ', পরিবর্তিত তৃতীয় সংস্করণ, এপ্রিল ২০১৩, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পৃ. ২২২।

অনূদিত গ্রন্থ

নিয়ম:

লেখক, গ্রন্থ, অনুবাদক, প্রকাশকাল, প্রকাশক, প্রকাশের স্থান, পৃষ্ঠা সংখ্যা

উদাহরণ:

বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য, মৃত্যুঞ্জয়, উষারঞ্জন ভট্টাচার্য (অনু), দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০১৫, সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লি, পৃষ্ঠা ৪৫।

বিশেষ কোন প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশ হওয়া গ্রন্থ

নিয়ম:

প্রতিষ্ঠানের নাম, শিরোনাম, প্রকাশের স্থান: প্রকাশক, বর্ষ, পৃষ্ঠা সংখ্যা

উদাহরণ:

বাংলাদেশ শহীদ স্মৃতি সমিতি, 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম প্রসঙ্গে', ১৯৭২, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা, পৃ. ৪৫

পুথি

নিয়ম:

লেখক, পুথির নাম, অনুলেখক, লিপিকাল, সংরক্ষণস্থান, বিশেষ তথ্য, পৃষ্ঠা সংখ্যা

উদাহরণ:

অজ্ঞাত, 'চৈতন্যকথা', অজ্ঞাত, ১৮৩২, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, , ২৯/৫৭

অপ্রকাশিত গবেষণা সন্দর্ভ

নিয়ম:

গবেষকের নাম, শিরোনাম, জমা দেওয়ার সময়কাল, প্রতিষ্ঠান, উপাধির উদ্দিষ্ট বা তথ্য, পৃষ্ঠা সংখ্যা

উদাহরণ:

সঞ্জয় ভট্টাচার্য, 'বাংলা ও অসমিয়া নদী কেন্দ্রিক উপন্যাস একটি তুলনামূলক অধ্যয়ন', ২০১২, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়, পিএইচডি অভিসন্দর্ভ (অপ্রকাশিত), পৃ. ১১০

পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ

নিয়ম:

লেখক, প্রবন্ধের শিরোনাম, পত্রিকার নাম, সংকলক বা সম্পাদক, সংখ্যা, বর্ষ, প্রকাশক, প্রকাশের স্থান, পৃষ্ঠা সংখ্যা

উদাহরণ:

রুশতী সেন, 'বাহিরের অন্দর' পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি পত্রিকা ৮, অন্নদাশঙ্কর রায় প্রমুখ (সম্পা), ১৯৯৫ , পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, পৃ. ৩৪

ই-জার্নাল বা অনলাইন পত্রিকা

নিয়ম:

লেখকের নাম, প্রবন্ধের শিরোনাম, পত্রিকার নাম, সংখ্যা, বর্ষ, পৃষ্ঠা সংখ্যা, ওয়েব, কবে ব্যবহার করেছেন (তারিখ, মাস, বর্ষ)

উদাহরণ:

হুমায়ুন কবির, প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্য ভাবনা ও ভাষাদর্শ, কালি কলম,জানুয়ারি ২০২৫

শুভময় রায়, 'উর্দু কাব্যের ঈশ্বর', 'পরবাস', সংখ্যা ২৭, https://www.kaliokalam.com/article জানুয়ারি ২০২৫, ১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫

ওয়েবপেজ

নিয়ম:

নাম, ওয়েব, তথ্যটি কবে আপলোড বা শেষ আপডেট করা হয়েছে, কবে ব্যবহার করেছেন (তারিখ, মাস, বর্ষ)

উদাহরণ:

Brahmo Samaj, https://en.wikipedia.org/wiki/Brahmo Samaj, 20 May, 2022, 19 July, 2022

খ. লেখক-তারিখ বা পৃষ্ঠা পদ্ধতি (Author-date system)

এই পদ্ধতিতে মূল রচনায় নিয়ম নির্দিষ্ট থাকে। প্রথম বন্ধনীর ভেতর লেখক, প্রকাশকাল ও পৃষ্ঠা সংখ্যা দেওয়ার রীতি। শুধুমাত্র লেখক ও পৃষ্ঠা সংখ্যার উল্লেখেও সূত্র নির্দেশিত হয়।

এই পদ্ধতির নমুনা:

লোকসাহিত্য বা পুঁথি সীমিত, কিন্তু ভাষা সীমাবদ্ধ নয়। এটি বিচিত্রভাবে ছড়িয়ে আছে। তাই এর ক্ষেত্র বিস্তৃত। মানুষ বিচিত্র, তার ভাষাও বৈচিত্র্যময়। এদের মধ্যে কোন বিভাজন করে নয়, কিন্তু এদের বৈচিত্র অর্থাৎ মানুষের যত রকম বিভাজন আছে ভাষারও ততই বিভাজন আছে। যা নিয়ে গবেষণা কর্ম হতে পারে। (দীপক সেন, ২০২২, ৪৩)

অথবা

(দীপক সেন, ৪৩)

Bibliography অর্থাৎ বর্ণানুক্রমিক গ্রন্থপঞ্জিতে সূত্র নির্দেশ থাকবে-

নমুনা:

দীপক সেন, 'সাহিত্য- গবেষণা', শিক্ষক দিবস, ২০২২, বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতি সমাজ, গুয়াহাটি।

ঊর্ধ্বলিপি পদ্ধতি ব্যবহার করলে দুবার তথ্যের সবিশেষ উল্লেখ করা হয়। পাদটীকা বা অন্ত্যটীকায় এবং গ্রন্থপঞ্জির জায়গায়। লেখক-তারিখ বা পৃষ্ঠা পদ্ধতিতে সমস্ত তথ্য থাকে কেবল গ্রন্থপঞ্জিতে।

কয়েকটি সাধারণ দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হল।

লেখক-তারিখ পৃষ্ঠা পদ্ধতি:

একক লেখকের গ্রন্থ (প্রথম সংস্করণ)

নিয়ম: লেখক, গ্রন্থ, প্রকাশকাল, প্রকাশক, প্রকাশস্থান।

উদাহরণ:

রণজিৎ গুহ, 'রচনা সংগ্রহ' দ্বিতীয় খণ্ড, ২০১৯, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।

একজন লেখকের গ্রন্থ (সংস্করণ হওয়া)

নিয়ম:

লেখক, গ্রন্থ, প্রকাশকাল, প্রকাশক, প্রকাশের স্থান।

উদাহরণ:

সুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', চতুর্থ খণ্ড, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৯৯৮, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।

সম্পাদিত গ্রন্থ

নিয়ম:

সম্পাদক, গ্রন্থ, প্রকাশকাল, প্রকাশক, প্রকাশের স্থান।

উদাহরণ:

ক্ষেত্রগুপ্ত (সম্পা), মধুসূদন রচনাবলী, সংশোধিত সংস্করণ, ১৯৭৪, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা।

সম্পাদিত বা সংকলিত গ্রন্থের নির্দিষ্ট অধ্যায় বা প্রবন্ধ

নিয়ম:

লেখক, অধ্যায় বা প্রবন্ধের শিরোনাম, সম্পাদিত বা সংকলিত গ্রন্থ, সম্পাদক বা সংকলক, প্রকাশকাল, প্রকাশক, প্রকাশের স্থান।

উদাহরণ

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, 'জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি', উল্লিখিত বাংলা ও বাঙালির সহস্রাব্দ সন্ধান, পবিত্র সরকার (সম্পা), ২০০০, সমাজ রূপান্তর সন্ধানী তৃতীয় সহস্রাব্দ সমিতি, কলকাতা।

এই পদ্ধতি ব্যবহার করলে শুধুমাত্র বিষয়গত তথ্যের প্রয়োজনে পাদটীকা ব্যবহৃত হতে পারে। যদি কোন কিছু প্রয়োজনীয় মনে হয় যা মূল রচনায় অন্তর্ভুক্ত হয়নি তেমন ক্ষেত্রে এখানে পাদটীকা বা অন্ত্যটীকা ব্যবহার করা যেতে পারে। এছাড়া অনুবাদ সংক্রান্ত কাজে কিংবা ভূগোলের স্থান বর্ণনায় অথবা জীবন কথা বিষয়ক গ্রন্থে এরকম ব্যবহার কখন দেখা যায়।

একজন গবেষক যে বিষয়টি নির্বাচন করবেন, সে সম্পর্কে কী কী তথ্য আছে, তার মূল্যায়ন গবেষককে করতে হবে। যে বিষয় নিয়ে গবেষক কাজ করবেন বলে মনস্থির করেছেন, সেই বিষয় সম্পৃক্ত পূর্ববর্তী কাজ সম্পর্কে লেখকের ধারণা থাকতে হবে এবং সেগুলির মূল্যায়ন করতে হবে। লিটারেচার রিভিউ-এর মধ্যে দিয়ে দু'টি কাজ হবে।

এক. অতীতের গবেষণার ক্ষেত্র, পদ্ধতি, সিদ্ধান্ত ইত্যাদি লেখক জানতে পারবেন। দুই. অতীতের কাজের পুনরাবৃত্তি বর্জন করে, নিজের কাজের ক্ষেত্রটিকে আরও সুচিহ্নিত করে নিতে পারবেন।

যদি এমন হয় যে, গবেষক যে বিষয়টি নিয়ে কাজ করতে চলেছেন সে বিষয়ে কোন লিটারেচার নেই, সে ক্ষেত্রে তথ্যের অলভ্যতা লেখককে উল্লেখ করতে হবে। নতুন কিছু খুঁজে পেলে বা আবিষ্কার হলে সে বিষয়ে পূর্বের কোন তথ্য না পাওয়াই স্বাভাবিক।

তবে সাহিত্যের কাজের ক্ষেত্রে গবেষকের উপাদানই হল লিটারেচার। সেগুলির মূল্যায়ন বা তার সমধর্মী উপাদানের মূল্যায়ন গবেষক করতেই পারে। তবে, এখানে Literature Review বলতে পূর্বেই যা কাজ হয়েছে তার মূল্যায়নকেই বোঝানো হয়েছে।

অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

২। সূত্র নির্দেশ প্রদানের প্রচলিত নিয়ম ও পদ্ধতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করুন। (২০০ শব্দের মধ্যে)

৭.৫ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

- গবেষণায় সূত্র বিষয়ে পরিচিত হতে পারবেন।
- গবেষণা সূত্রের প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে ধারণা গ্রহণ করতে পারলেন।
- সূত্রের বিভিন্ন ধরন বিষয়ে জানতে পারলেন।
- সূত্র বিষয়ে সামগ্রিক জ্ঞান সংগ্রহ দ্বারা তাকে বাস্তবে প্রয়োগ উপযোগী করে তুলতে পারলেন।

৭.৬ অতিরিক্ত পঠন

- ইসলাম, শেখ মকবুল (২০১২); গবেষণার পদ্ধতিবিজ্ঞান সাহিত্য-সমাজ-সংস্কৃতি; কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ
- ইসলাম ফখরুল, রাসুল মোহাম্মদ ইপ্তেখার সুলতানা নাসরিন এবং দাস সম্পা(২০১৭); থিসিস গবেষণা পদ্ধতি; ঢাকা : কালিকলম প্রকাশনা সংস্থা
- চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণদাস(২০০৫); সামাজিক গবেষণা : পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া; কলকাতা: আরামবাগ বুক হাউস
- পাল, দেবাশিস (২০১৯); গবেষণা পদ্ধতি ও রাশিবিজ্ঞানের কৌশল; কলকাতা: রীতি বুক এজেন্সী
- পাল শ্রাবণী ও দাস বেলা (সম্পা) (২০১১) গবেষণা তত্ত্বতালাশ; কলকাতা: পারুল প্রকাশনী
- বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরভি (২০২০); গবেষণা : প্রকরণ ও পদ্ধতি; কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং
- মুখোপাধ্যায়, জগমোহন (২০২০); গবেষণাপত্র অনুসন্ধান ও রচনা; কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স
- সাইফুদ্দীন, কাজী (২০২১); গবেষণা পদ্ধতি; ঢাকা : আবীর পাবলিকেশন্স
- সেন, দীপক (২০২২); সাহিত্য-গবেষণা; গুয়াহাটি : বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতি সমাজ

✓ ৭.৭ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত

১। আমার সর্পিল আলোচনা থেকে তুলে উত্তরসত্যের প্রধান লক্ষণগুলি তালিকার মতো সাজিয়ে দিলাম: মিলিয়ে দেখতে সুবিধা হবে। এ সব কথাই পূর্বে বিস্তারে আলোচনা হয়েছে, কখনও কখনও সেই ভাষাই নীচে ব্যবহার করেছি।... উত্তরসত্য অবশ্যই মিথ্যা, কিন্তু সব মিথ্যা উত্তরসত্য নয়। উত্তরসত্যের লক্ষ্য কেবল ঠকানো নয়, অসত্য প্রতিষ্ঠার জন্য একটা অসার চিন্তাপ্রণালী লোকমানসে প্রতিষ্ঠা করা, এবং তার দ্বারা রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনকে প্রভাবিত করা। এই ভাবে উত্তরটি সাজিয়ে লিখুন। (দ্রষ্টব্য ৭.৩ অংশ)

২। সাধারণত সূত্র নির্দেশের ক্ষেত্রে দু'টি রীতির কথা বলা যেতে পারে:.....'

⑦ ৭.৮ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। সূত্র নির্দেশের পরিচয় প্রদান করুন।

২। সূত্র নির্দেশ প্রদানের প্রচলিত নিয়ম ও পদ্ধতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করুন।

*** *** ***